গান্ধীজীর শিক্ষা চিন্তা

sites.google.com

১৭.০৫.২০২০

অনেকেরই জানা আছে যে ১৯৩৮ সালে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বড়ো আকারে কংগ্রেসের উত্থান ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও জাতীয় কংগ্রেসের অনুমোদনক্রমে কংগ্রেস শাসিত বিভিন্ন প্রাদেশিক শিক্ষা দপ্তর নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষাকে তাদের শিক্ষানীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বর্তমানে এখানে ওখানে কোথাও কোথাও নামমাত্র এই শিক্ষাব্যবস্থা টিকে আছে। সেগুলোও গান্ধীজি প্রস্তাবিত ও প্রবর্তিত 'নঈ তালিম'-এর সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারছে, তা প্রশ্নাতীত নয়। গান্ধীজি দীর্ঘসময় ধরে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাঁর শিক্ষাচিন্তা ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিলেন। জাকির হোসেনকে নিয়ে কমিটি তৈরি করেছিলেন। আর্যনায়কম দম্পতির মতো মানুষদের শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে গেছেন। একটা নতুন শিক্ষানীতি এইভাবেই গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে বহু ব্যক্তিত্ব জড়িয়ে আছেন। বিজয় ভট্টাচার্য, সাধনা ভট্টাচার্য সেই শিক্ষানীতিকে ফলিত রূপ দিতে চেয়েছিলেন। মানভূমে 'মাঝিহিরা' গ্রামে চিত্তভূষণ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গান্ধীজির নয়া শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪০ সালে। নানা মতের মঞ্চ কংগ্রেস সেই ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে স্থির করেছিল, ভারতবাসীকে শিক্ষায় সচেতন ও স্বয়ম্ভর করতে গান্ধীজির শিক্ষানীতিকেই প্রয়োগ করতে হবে।

<u>নঈ তালিম প্রয়োগে অবহেলা</u>

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যে শিক্ষাব্যবস্থা আসমুদ্র হিমাচলে প্রযুক্ত হল, তাতে গান্ধীজির নয়া শিক্ষাপদ্ধতি ধীরে ধীরে অপসৃত। বরণ করে নেওয়া হল ভারী শিল্পনীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিক্ষানীতিকেই। স্বাধীনতা উত্তর যুগে কিছুটা গান্ধীজির ভাবাদর্শে বুনিয়াদি শিক্ষা বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু 'কোঠারি কমিশন' বুনিয়াদি শিক্ষাক্রমকে সাধারণ প্রচলিত শিক্ষারই সঙ্গে কর্ম অভিজ্ঞতা (work experience) নামে সংযুক্ত করে বুনিয়াদি শিক্ষার জীবনভোমরাকে হত্যা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বুনিয়াদি শিক্ষাদর্শন ও তার বাস্তব প্রয়োগ একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই কাজটি অত্যন্ত তড়িৎগতিতে সম্পন্ন হয়।

গান্ধীজির কাম্য ছিল এমন ভারত, যে ভারতে প্রতিটি মানুষ স্বনির্ভর, প্রতিটি গ্রাম স্বয়ম্ভর। গান্ধীজির এই কামনা রাষ্ট্রযন্ত্রের তথাকথিত উন্নয়নের তাগিদে হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে ভারতে আজ সমধর্মী সমাজের বদলে ভোগধর্মী সমাজ কায়েম হতে চলেছে। বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বাদ দিলেও পশ্চিমি বিশ্বায়নের সমর্থক যে শিক্ষাব্যবস্থা ভারতে চালু হয়েছে, তার একপ্রান্তে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা --- অন্যপ্রান্তে পাঁচলক্ষ টাকার বিনিময়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে পুনের কাছে প্রতিষ্ঠিত এক কংগ্রেস নেতার নামাঙ্কিত বিদ্যালয়। এই দুই ধরনের বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যে ছাত্রছাত্রী সমাজের দায়িত্ব নেবে, তাদের কি কোন মিলনবিন্দু আছে? বিদ্যালয় শিক্ষাই ভারতকে নানা শ্রেণীতে ভাগ করে দেবে। অথচ কথা ছিল, ভারতে থাকবে বহু ধরনের নয়, এক ধরনের 'কমন স্কুল সিস্টেম'। এই সিস্টেম থাকলে ভেদ তৈরি হতে পারত না।

গান্ধী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ভারতের প্রয়োজন গান্ধীজি অনুধাবন করেছিলেন। নানা জাতি নানা ভাষা নানা ধর্ম নানা সংস্কৃতির মানুষকে ভারতে একত্রিত রাখতে হলে চাই জাতীয় সংহতির চেতনা, ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা; চাই অস্পৃশ্যতার বর্জন; চাই পরমত সহিষ্ণুতা, চাই অহিংসাকে জীবনে প্রয়োগ। গান্ধীজি তাই তাঁর শিক্ষানীতির কয়েকটি মূলসূত্র রচনা করেছিলেন :

১. প্রীতি (সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব)

২. মুক্তি (অপরের ওপর, জীবনধারণের জন্য, নির্ভরতাহীন স্বাবলম্বন)

৩. অভিব্যক্তি (নানা সৃজনশীল কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিকশিত করা)

৪. অহিংসা (রিপুকে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার পথে প্রবাহিত করা)

৫. সত্যাগ্রহ (সত্যের প্রতি আগ্রহ, অসত্যের অন্যায়ের প্রতিরোধ)

৬. সাফাই (পরিবেশ চেতনা, সৌন্দর্যের চর্চা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা)

একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতবাসী যদি অহিংস না হয়, তবে এত বিভিন্নতার মধ্যে এক জাতি হিসেবে বাস করতে পারবে না। এই অহিংসা পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারায় কোথাও নেই। উপরন্তু গরিব দেশের জন্য গরিব মানুষেরা জোগাতে পারে এমন কম খরচের শিক্ষার কথা গান্ধী ভেবেছিলেন, এমন শিক্ষা যা বেকার তৈরি করবে না।

নঈ তালিম প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ও সচেতনতা

এখন দেখা যেতে পারে, আধুনিক শিক্ষাধারার সঙ্গে গান্ধীজির শিক্ষানীতিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় কিনা এবং তা দুই ধারার মধ্যে মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিক ব্যর্থতা লক্ষ্য করে এখনও গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছু শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী এখনকার পটভূমিতে বুনিয়াদি শিক্ষাকে প্রয়োগ করার কথা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুনিয়াদি শিক্ষার মূলধারাকে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করে জীবনমুখী এক সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা কীভাবে প্রবর্তন করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। এগুলিই আদর্শগত লড়াইয়ের পদক্ষেপ।

আজকের সংকট ও তার মোকাবিলা

একুশ শতকের প্রেক্ষিতে আজকের আর্থ-সামাজিক সংকটময় পরিস্থিতিতে গান্ধীর নয়া শিক্ষাক্রম গ্রহণ করার প্রসঙ্গে ফিরে দেখা প্রয়োজন। আজকের পৃথিবীর ছবিটা মাথায় রেখে আলোচনা প্রয়োজন। বিরানব্বই বছরের মাইক্রোবায়োলজিস্ট ডো ফ্রাঙ্ক ফেনার সম্প্রতি তাঁর গবেষণায় মন্তব্য করেছেন, আগামী একশ বছরে মানব গোষ্ঠী (Homosapiens) পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। চমকে দেওয়ার মতো মন্তব্য। কিন্তু কেন একথা উঠে এল?

প্রকৃতির দিকে তাকালে দেখা যায়, জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ অরণ্য, ভূমি, বাতাস, জল সংকটাপন্ন। অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। প্রতি বছর ১৩০ লক্ষ হেক্টর অরণ্য হারিয়ে যাচ্ছে। অরণ্যকে ধ্বংস করে, জমিকে ভুলভাবে ব্যবহার করে মরুভূমির বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। হাজার হাজার হেক্টর জমি প্রতি বছর মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পৃথিবীর উষ্ণায়ন আজকের সবচেয়ে বড়ো সংকট। ধ্বংসাত্মক আবহাওয়ায় বিপন্ন পৃথিবী ও পৃথিবীর প্রাণ। তেমনই দ্রুত বেড়েছে জলসংকট। অনেকেই মনে করে, এই জলসংকট যুদ্ধের হেতু হয়ে উঠতে পারে। ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ জলাভাবে প্রাণ হারাবে। অজস্র 'প্রাণ' হারিয়ে যাবে, ঘন্টায় এক-একটা প্রজাতি। গত তিন শতকে ১১৫ রকমের পাখি, ৫৮ রকমের স্তন্যপায়ী হারিয়ে গেছে।

সমাজের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, ভারতে প্রতি তিন মিনিটে একটি শিশু অপুষ্টিতে মারা যায়, দারিদ্র্যসীমার নিচে ৭০% ভারতীয়, অপুষ্ট ৫০% শিশু, আশি কোটি লোকের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে ৮৬৯২২ জন চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।

স্পষ্টতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ উন্নতির পদক্ষেপ না হয়ে সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষকে ধর্ম থেকে, পরিবার থেকে, ইতিহাস ও শিক্ষার থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আমেরিকার চিন্তাবিদ ডঃ নীল পোস্টম্যান লিখছেন, আমেরিকার সভ্যতা ধ্বংসের মুখে। ৮৫% শিশু এক বাবা বা মায়ের (single parent home) আশ্রয়ে থাকছে। প্রতি বছর লক্ষাধিক লোক উদ্বাস্তু হয়ে রাস্তা বা সাবওয়েতে আশ্রয় নিচ্ছে। ১৯৫০ থেকে আজ অবধি হিংসাত্মক অপরাধ বেড়েছে ১১০০০ শতাংশ। যে কোন দশজন আমেরিকাবাসীর মধ্যে দুজন থাকে মানসিক চিকিৎসালয়ে। শহর যানবাহনের চাপে শ্বাসরুদ্ধ। জল দূষিত, বৃষ্টি অ্যাসিডপূর্ণ। আমেরিকার মানুষ বিশ্বের অন্য যে কোন অঞ্চলের মানুষের চেয়ে বেশি অ্যাসপিরিন খায়। পাশ্চাত্য দুনিয়ার মধ্যেও এখানে শিশুমৃত্যুর হার বেশি। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা মাদকাসক্ত।

গান্ধীজি অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন, পশ্চিমি শিল্প ও বাণিজ্য ভিত্তিক সমাজ হিংসার উৎস। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক সভ্যতা এক যান্ত্রিক সভ্যতা। এই সভ্যতা থেকে উঠে আসে কেন্দ্রীভুত শাসন, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধভিত্তিক অর্থনীতি। এই সভ্যতা অর্থের প্রাচুর্য আর ভোগ এনে দিতে পারে শুধু মুষ্টিমেয়র জন্য। কিন্তু গোটা বিশ্বের শান্তি বা সুখ দিতে পারে না। একটা শিল্পসমাজ কেবল পণ্য উৎপাদন বাড়িয়ে যাবে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনে। সেটাই বারবার অর্থনীতিতে ধস আনবে। ২০০৭ থেকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সেরকম এক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে।

পশ্চিমি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের বদলে গান্ধীজি তাই গ্রাম নির্ভর অর্থনীতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, আধুনিক সভ্যতা ভোগবাদী এবং সহজ সরল জীবনের পরিপন্থী। একজনের সুবিধা যদি অন্যজনকে অসুবিধায় ফেলে, সেটা উন্নতি নয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও একইভাবে চিন্তা করেছিলেন। তাঁর কল্পনায় সমাজ হবে 'বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট সমাজ'। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।

গান্ধীজি এই সমাজ নির্মাণ মাথায় রেখেই এক নতুন শিক্ষানীতির কথা বলেছিলেন --- নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা। শিক্ষা হবে কর্মকেন্দ্রিক, উৎপাদনমূলক, স্বনির্ভর। এই কায়িক প্রশিক্ষণের অর্থ এই নয় যে বিদ্যালয় ভবনের সংগ্রহশালায় কিছু খেলনাপাতি তৈরি করে রেখে দেওয়া হবে, যার কোন মূল্য নেই। বিক্রয়যোগ্য জিনিস তৈরি হবে বিদ্যালয়ে।

জাকির হোসেন ভয় পেলেন, শিক্ষকেরা এই নীতি বা নিয়মে গরিব ছাত্রদের শ্রমকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবে, অথবা তারা হবে 'দাসেদের চালক'। কে টি শাহের মতে, কেবল পাঠ্যপুস্তক সর্বস্ব এবং মুখস্থ বিদ্যা সর্বস্ব আজকের পঠনের ক্ষতিকারক দিকের বদলে সেই ব্যবস্থা হয়ে উঠবে শ্রম সর্বস্ব, অসঙ্গত ভাবে ছাত্রদের থেকে শ্রম আদায়ের পন্থা মাত্র। তখন শিক্ষার মূল আদর্শ পড়ে থাকবে পিছনে। এই বিতর্কে ভারতের শিক্ষানীতি থেকে হারিয়ে গেল 'নঈ তালিম'। ব্যতিক্রম হিসেবে রয়ে গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গুজরাত, মহারাষ্ট্র বা পশ্চিমবাংলার কয়েকটি গান্ধী আশ্রম। তারা গান্ধীর স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করল --- সরল কিন্তু সৎ, উৎকৃষ্ট নৈতিক জীবন, কৃষিসমাজ --- শ্রম যেখানে জীবনধারণের জন্য, জীবিকার জন্য নয়।

স্বাধীনতার পর ভারতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ৪.৫ লক্ষেরও বেশি স্কুল, ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষণের মহাবিদ্যালয়, বেশ কিছু শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তবু শিক্ষার মান নিম্নমুখী। উৎকর্ষতা লাভের জন্য সংগ্রাম, নতুন কিছু প্রবর্তনের উৎসাহ, দুঃসাহসিক কাজের ঝুঁকি নেওয়া সীমাবদ্ধ সামান্য কিছু মানুষের মধ্যে। বাকি মানুষ হয় হুকুম তামিল করে অথবা সুবিধাভোগী।

<u>নঈ তালিম ও প্রাথমিক শিক্ষা</u>

গান্ধীজির শিক্ষানীতি সমাজ সংস্কারের পথ ধরেই হয়েছিল। তাই সেই নীতিকে ফিরে দেখার প্রয়োজন পড়েছে। গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা ছিল সকলের জন্য। সব শিশুর জন্য। সব রাষ্ট্রকেই বুঝে নিতে হবে কী ধরনের নাগরিক সে তৈরি করবে। সৃষ্টিশীল, মৌলিক চিন্তার অধিকারী, সাহসী উদার, নাকি সঙ্কীর্ণ মনের এবং অন্যদের ঘৃণার চোখে দেখে এমন।

তাই ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষার সেই তালিম প্রয়োজন, যা উপরোক্ত উৎকৃষ্ট নাগরিক তৈরিতে সক্ষম। হিন্দুস্তানি তালিম সংঘ গান্ধীজির শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করে যে পাঠক্রম তৈরি করেছিল, তা হল :

১. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, এর থেকেই আসবে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা।

২. গ্রামীণ শিল্পের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও সেই জ্ঞানের সাহায্যে আরও উন্নতি।

৩. শিক্ষকের ভূমিকা শিশুকে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করে দেওয়া নয়, তার সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে আবিষ্কার করে তাকে উপযুক্ত কাজে প্রেরণা ও দায়িত্ব দেওয়া। এইভাবে গণতান্ত্রিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

৪. ছেলে ও মেয়েকে সমান স্থান দেওয়া।

৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া।

৬. দেশ পরিচালনার দক্ষতা ও ক্ষমতাগুলি বাড়ানোর জন্য বিশেষ তালিম দেওয়া। যেমন ভোটিং, ডিবেট প্রভৃতিতে অংশ নেওয়ানো।

বুনিয়াদি শিক্ষার প্রস্তাবিত কাঠামো

নতুন একদল শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা আজ সবচেয়ে বেশি যারা বুনিয়াদি শিক্ষাক্রমকে সঠিক আত্মস্থ করতে পারবে। শিক্ষা দেওয়া তার কাছে একঘেয়ে নয় বা শুধু জীবিকার জন্যও নয়। শুধুমাত্র টাকার অঙ্ক বাড়ালেই তাদের মনোভাব (attitude) বদলাবে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মিড-ডে মিল গরিব ছেলেমেয়েদের লোভ দেখিয়ে স্কুলে আনার জন্য শুধু নয়, শিশুর পুষ্টিই মূল কারণ।

বিদ্যালয় বা গৃহে পরিচ্ছন্নতায় শিশুর অংশগ্রহণ শিশুশ্রমের আওতায় পড়ে না। নিজের বাড়িতে কাজ আর রাস্তার ধারে অন্যলোকের চায়ের দোকানের কাজ এক নয়।

অভিভাবকদের ক্রমান্বয়ে জীবিকার সন্ধানে স্থান পরিবর্তন শিশুদের শিক্ষার বিরাট অন্তরায়। তাই আবাসিক স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

স্বাস্থ্যচর্চা, খেলাধূলা স্থানাভাবে শহরের স্কুলগুলিতে হয় না। অথচ এটা আবশ্যিক। আমাদের দেশ তাই খেলাধূলায় পিছিয়ে থাকে। কিন্তু ক্রীড়াদর্শক সবচেয়ে বেশি। আমরা সমালোচক ও তারিফ করার মানুষ যত সৃষ্টি করি, খেলায় অংশগ্রহণকারী তত তৈরি করতে পারছি না।

গান্ধীজি শিক্ষাকে জীবনমুখী করার কথা বলেছেন। শিক্ষা তথা জ্ঞান নির্ভর করে স্থান, কাল ও পরিবেশের ওপর। বিজ্ঞান --- যা বিশেষ জ্ঞান, তাই যদি 'সত্য' হয়, টেকনোলজি বা প্রযুক্তিই তৈরি করে সত্যাগ্রহী। সেই সত্যাগ্রহী প্রযুক্তির ব্যবহারে তার সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারে এবং সমস্যার সমাধানও করে ফেলে। গ্রামে গ্রামে সেই সত্যাগ্রহী তৈরি করবে বুনিয়াদি শিক্ষা।

বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম কর্মকেন্দ্রিক। সেই কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর শিক্ষা সম্পন্ন হবে। এই কর্ম কখনও কখনও শিল্পের রূপ নেবে। তাই বুনিয়াদি শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক --- craft centred। পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকতে পারে বয়ন বা কৃষি; থাকতে পারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অথবা তথ্যযন্ত্র; থাকতে পারে অতি আধুনিক কোন শিল্প যা সংশ্লিষ্ট বসতিতে সহজ ও সুলভ। পাঠক্রম সেই শিল্পকে ঘিরে শিশুশিক্ষায় নানা বিষয়কে আনবে। সেই বিষয়গুলির সঙ্গে সম্যক পরিচয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

ধরা যাক, চরকা কেন্দ্রিক বয়নশিল্পের কথা। এই বয়ন থেকে অনেক বিষয় আসবে। যেমন --- বয়ন শিল্প >> জমি/মাটি >> বৃক্ষরোপণ/বৃক্ষের বৃদ্ধির পর্যায় >> ফল >> তুলো আহরণ পদ্ধতি >> সংরক্ষণ পদ্ধতি >> নানা প্রকারের তুলো >> তুলো থেকে সুতো >> সুতো কাটার যন্ত্র >> কুটির শিল্প/বৃহৎ শিল্প >> সুতো রঙ করা >> নানা ধরনের তাঁত >> কাপড় তৈরি নক্সা >> রক্ষণ >> বিক্রয় প্রভৃতি।

পাঠক্রমের প্রয়োজনে শিশুর বয়স অনুযায়ী একাধিক শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। শিশুর নানা ধরনের কাজ করার ফল হবে --- ১. ইন্দ্রিয়গুলির সম্যকচর্চা; ২. নানা কৌশল

আয়ত্বকরণ; ৩. ব্যবহারিক কর্মদক্ষতা অর্জন; ৪. শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে প্রত্যয়; ৫. শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সম্পর্ক; ৬. শৃঙ্খলাবোধের সঞ্চার; ৭. মূল্যবোধ আয়ত্ব করা; ৮. সকলের সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস; ৯. নেতৃত্ব দেওয়ার কৃৎ কৌশল এবং ১০. নেতৃত্ব মেনে কাজ করার মানসিকতা।

খেলাধূলা হবে উদ্দেশ্যমূলক ও গঠনমূলক। লক্ষ্য হবে স্বাস্থ্যের উন্নতি, শৃঙ্খলাজ্ঞান ও ব্যক্তিস্বত্তার বিকাশ।

নৃত্যগীত, অভিনয়, বিতর্কসভা, পত্রিকা, সাহিত্যসভা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ এসবের মধ্য দিয়ে শিশুর নান্দনিক সম্ভাবনার বিকাশ।

বুনিয়াদি শিক্ষার ধারাকে কীভাবে সময়ানুগ ও সচল করা যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ও বিতর্ক আরম্ভ করার দায় আমাদের সকলের। বুনিয়াদি শিক্ষাকে গান্ধীজির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলা হয়।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে হাতে কলমে কাজ হবে, উৎপাদন হবে। তবু একথা মনে রাখতে হবে যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়টি একটি শিক্ষাকেন্দ্র, কারখানা নয়। উৎপন্ন দ্রব্য থেকে বিদ্যালয়ের খরচের কিয়দংশ আসতে পারে। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মাইনের দায় সমাজকে, সরকারকে নিতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার দায় সরকারের।